"সঙ্কল্পে যে দৃঢ়, প্রতিজ্ঞায় যে অবিচলিত, যাবতীয় সিদ্ধি তার করতলগত। সঙ্কল্প ছাড়িব না, প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিব না, এই সার নীতি যার, সেই একমাত্র বিশ্বজয়ী হইতে পারে।"
যুগাচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ
প্রতিষ্ঠাতা, ভারত সেবাশ্রম সংঘ

মায়ের ডাক
MAYER DAK

www.mayerdak.com

"সত্যকে আজ হত্যা করে
অত্যাচারীর খাঁড়ায়
নেই কিরে কেউ সত্য সাধক
বুক খুলে আজ দাঁড়ায়"
—নজরুল

মাসিক বুলেটিন DL. No. 129/2000 E-mail : subhas.chkrbrty@rediffmail.com জুলাই ২০১১ মূল্য ঃ ১ টাকা

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু উৎপীড়ন অব্যাহত

নিজস্ব বাংলাদেশ প্রতিনিধি প্রেরিত ঃ

● ৬ জুন ২০১১ গভীর রাতে, মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া শহরের দক্ষিণ বাজার এলাকায় লাবণী ড্রাগ হাউসের ভেতর কতিপয় মুসলিম সশস্ত্র দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়েছে। হামলাকারীরা উক্ত প্রতিষ্ঠানের হিন্দু কর্মচারী অরবিন্দ চক্রবর্ত্তীকে (৩৫) নির্মমভাবে হত্যা করেছে। ড্রাগ হাউসের ক্যাশবাক্স ভেঙ্গে লক্ষাধিক টাকা লুটপাট করে নিয়ে গেছে।

● ৯ জুন ২০১১ সন্ধ্যায়, যশোর জেলার যশোর সদর উপজেলার চাঁচরা বর্মণ পাড়ার হিন্দু বাসিন্দা নিতাই বর্মণকে (৪০) কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত জবাই করে (গলা কেটে) নির্মমভাবে হত্যা করে লাশ রাস্তার পাশে ফেলে রেখে যায়।

● ৭ জুন ২০১১ গভীর রাতে, চট্টগ্রাম শহরের পাহাড়তলী থানার অন্তর্গত দক্ষিণ কাট্টলী এলাকার দরিদ্র হিন্দু যুবতী পান্না রানী দাসকে (২০) কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত অপহরণ করেছে। যুবতীর সম্ভ্রম লুটের পর তাকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে। প্রমাণ লোপ করতে লাশ স্থানীয় হরিমন্দির শ্মশানে দাহ করা হয়। কিন্তু অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় লাশ ফেলে দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়। পুলিশ উক্ত লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। ঘটনায় জড়িত সন্দেহে মোঃ ইকবাল (২২) নামে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

● সম্প্রতি বান্দরবান জেলার লামা উপজেলার নাইক্ষ্যং মৌজায় আদিবাসী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী লাইপুং মুরুং এর আনুমানিক ৩৫০০০০ টাকা মূল্যের সাতটি সেগুন গাছ, এলাকার প্রভাবশালী ক্ষমতাসীন আওয়ামী লিগ নেতা জাহিদুল ইসলামের দলবল লুট করে কেটে নিয়ে গেছে। জমির মালিক ও তার প্রতিবেশীরা বাধা দিতে যেয়ে দুর্বৃত্তদের হাতে প্রহৃত হয়েছেন।

● ৬ জুন সকাল ৯টায়, দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলার উত্তর কাজীপাড়া গ্রামের হিন্দু বাসিন্দা, দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়ের একমাত্র কন্যা এইচ. এস. সি. পরিক্ষার্থী কলেজ ছাত্রী প্রিয়াংকা রায় (১৮) কলেজে যাবার পথে অপহৃত হয়েছে। এলাকার চিহ্নিত মুসলিম দুর্বৃত্ত মোঃ নয়ন শেখ আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে উক্ত কিশোরীকে লোকালয় থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। কিশোরীর আর্ত চিৎকারে কোন মানুষ তাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসে নাই। স্থানীয় থানায় একটি অপহরণ মামলা দায়ের করা হলেও পুলিশ অদ্যবধি কিশোরীকে উদ্ধারের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই।

● সম্প্রতি ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলার বাচকান্দা বাজার এলাকায় সংখ্যালঘু হিন্দু পরিবারের ওপর কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়েছে। হামলাকারী মোমতাজ আলী, কলিম উদ্দিন, ছলিম উদ্দিন আসাদ, সাদ্দাম, বাচ্চু মিয়া ও নজরুল সেখদের বেদম প্রহারে পল্লী চিকিৎসক সুধীরচন্দ্র দাস, তার ভাই সুশীলচন্দ্র দাস ও সুবোধচন্দ্র দাস গুরুতর আহত হয়েছে।

● ২ জুলাই ২০১১ রাতে, টাঙ্গাইল জেলার বাসাইল উপজেলার মিরিকপুর গ্রামের হিন্দু বাসিন্দা সঞ্জয় সূত্র ধরকে (৩৫) কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত ধারালো অস্ত্র দিয়ে (জবাই) করে গলা কেটে নির্মমভাবে হত্যা করেছে।

● ২৭ মে ২০১১ রাতে, দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর উপজেলার খাট্টাউজনা গ্রামে হিন্দু সম্প্রদায়ের রাধাগোবিন্দ মন্দিরে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়ে তিনটি পূজিত প্রতিমা ভেঙ্গে দিয়েছে। মন্দির কমিটির লোকজন স্থানীয় থানায় এবিষয়ে একটি মামলা দায়ের করেছেন।

● ২৯ মে ২০১১ বিকাল সাড়ে তিনটার সময়, রাঙামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলা সদরে তালুকদার পাড়া এলাকায় আদিবাসী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী শনীময় চাকমা (৩২) সশস্ত্র ইসলামী সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হয়েছে।

● ২৮ মে ২০১১ গভীর রাতে, গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া উপজেলা সদরে বাংলাদেশ অশ্বিনী সেবাশ্রম মন্দিরে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়ে তিনলাখ টাকা মন্দিরের সম্পত্তি লুট করে নিয়ে গেছে।

● ৭ জুন ২০১১ সন্ধ্যায়, গোপালগঞ্জ জেলার রঘুনাথপুর ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচনে পরাজিত আওয়ামী লীগ প্রার্থীর সমর্থকরা এলাকায় সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর ব্যাপক হামলা চালিয়েছে। হামলাকারীরা সিলনা গ্রামে বসু মার্কেটে ২০টি হিন্দু দোকান, ৩০টি বাড়ি ভাংচুর ও লুট পাট করেছে, বেদম প্রহারে নারী ও শিশু সহ ২৫ জন গুরুতর আহত হয়েছে।

● ১৯ জুন ২০১১ সন্ধ্যায়, নড়াইল জেলার নড়াগাতি থানায় অন্তর্গত বাঐ সোনা ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে পরাজিত আওয়ামী লীগ প্রার্থী মোঃ ওহাব মোল্লার নেতৃত্বে একদল মুসলিম দুর্বৃত্ত এলাকায় হিন্দু বাসিন্দাদের ওপর ব্যাপক হামলা চালিয়েছে। হামলাকারীরা নলামারা গ্রামের বিমল পাল, সুবোধ বালা, অপরেশ বিশ্বাসের দোকান ভাংচুর এবং লুটপাট করে। ক্ষিতিশ নন্দী, বিদ্যুৎ নন্দী, শংকর বিশ্বাস, সমর বিশ্বাস, পীযুষ দাস, বরুণ পাল, প্রভাষ ব্যাপারী, শৈলেন দাস, অরুণ বিশ্বাস ও নীতিশ বিশ্বাসের বাড়ী ঘর ভাংচুর লুটপাট চালিয়ে আনুমানিক দশ লাখ টাকার মালপত্র নিয়ে গেছে। দুর্বৃত্তদের আয়ত্বে আনতে পুলিশ তিন রাউণ্ড শুন্যে গুলি ছুঁড়তে হয়েছে।

● ২১ মে ২০১১ মধ্য রাতে, মৌলভী বাজার জেলার বড়লেখা উপজেলার হাকালুকি হাওরে ভাসমান জলে মৎস শিকার অবস্থায় হিন্দু যুবক সুজিত বিশ্বাস (৩০) কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্তের গুলিতে নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় স্থানীয় থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে।

● ১০ জুন ২০১১ সন্ধ্যায়, যশোর জেলার কেশবপুর সদর এলাকায় হিন্দু বাসিন্দা সুবোল পাল কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্তের হামলায় গুরুতর আহত হয়েছে। স্থানীয় থানায় এ ঘটনায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

● ৯ ও ১১ জুন ২০১১ দিবালোকে, মৌলভী বাজার জেলার শ্রীমঙ্গল ইউনিয়নের সবুজবাগ গ্রামের হিন্দু বাসিন্দা পরিমল দাশ, জ্যোর্তিময় রায় ও রথীন্দ্রনাথ রায়ের মালিকানাধীন তিনটি পুকুর থেকে আনুমানিক ৯ লাখ টাকার মাছ একদল মুসলিম দুর্বৃত্ত লুট করে নিয়ে গেছে।

● ২৯ মে ২০১১রাতে, রাঙামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার তালুকদার পাড়ায় কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়েছে। আগ্নেয়াস্ত্রধারী দুর্বৃত্তদের গুলিতে আদিবাসী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী সোহেল চাকমা (২৮) নিহত হয়েছে।

● ৭ জুন ২০১১ সন্ধ্যায়, রংপুর জেলা শহরে কারমাইকেল কলেজের অধ্যক্ষ হিন্দু দীপকেন্দ্র নাথ দাসকে হত্যার চেষ্টা করে। কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত বোমা ফাটিয়ে অধ্যক্ষের ঘরের দিকে গুলি ছুড়ে আতংকের সৃষ্টি করে।

● ৮ জুন ২০১১ দুপুরে, খুলনা থেকে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকা প্রবাহ যশোর ব্যুরো প্রধান প্রদীপ ঘোষ ও রাজু আহামেদের ওপর কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়েছে। হামলায় দুই সাংবাদিক গুরুতর আহত হয়েছেন।

● ২৬ জুন ২০১১ ভোরে, রাঙামাটি জেলার জুরাছড়ি উপজেলার খিলাতলি গ্রামের আদিবাসী বৌদ্ধধর্মার্বলম্বী বিজয় সিংহ চাকমাকে (৩১) আগ্নেয়াস্ত্র ধারী কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্তগুলি করে হত্যা করেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি অধিগ্রহণের খেসারত

৩ মে। বান্দরবানের রুমা উপজেলার পাহাড়িদের দিনটি শুরু হয় অন্যভাবে। রাতের প্রথম প্রহরে ঘুম থেকে উঠে নারীরা রান্নাবান্নায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কারণ, আজ তাঁদের অনেকখানি পথ পাড়ি দিতে হবে। রোজকার রুটিনের চেয়ে আজকের দিনটি যে বিশেষভাবে কাটাতে হবে।

ভোর চারটা। রুমা বাজার কয়েক শ লোকে ভরে গেছে। সবার চোখে মুখে দৃঢ়তা। লংমার্চ করে তাঁরা বান্দরবান শহরে যাবে নিজেদের ভিটেমাটি রক্ষার জন্য প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশ করতে। কারণ রুমা সেনানিবাস সম্প্রসারণের জন্য সরকারিভাবে নয় হাজার ৬৫০ একর জমি অধিগ্রহণের যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, এর ফলে ওই এলাকার তিনটি মৌজার অধিকাংশ স্থায়ী বাসিন্দা বাস্তুচ্যুত হয়ে পড়বে। এই উদ্যোগ থেকে সরকার যাতে বিরত থাকে, সে জন্য তাঁরা আজ এ দীর্ঘ পথ পাড়ি দেবেন। ভোররাতে রওনা হয়ে বৈশাখের কাঠফাটা রোদ উপেক্ষা করে দীর্ঘ ১২ ঘণ্টায় প্রায় ৫০ কিলোমিটার উঁচু-নিচু পাহাড়ি পথ পাড়ি দিয়ে শেষ বিকেলে তাঁরা বান্দরবান শহরে পৌঁছান।

রুমা উপজেলার বটতলী গ্রামের উচিং মণ জীবনে কখনো বান্দরবান জেলা শহরে আসার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি, অধিকাংশ সময় তিনি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে বিচরণ করে প্রকৃতি থেকে জীবনের আনন্দ বেদনার স্বাদ নিয়েছেন। বান্দরবানের প্রকৃতি, বগা লেক, চিম্বুক, তাজিনডং তাঁকে মাতৃছায়া দিয়েছে। কিন্তু আজ যখন তাঁর এই স্বাভাবিক যাপনে আগ্রাসনের থাবা পড়েছে, তখন তিনি অসুস্থ শরীর নিয়ে ১২ ঘণ্টা হেঁটে বান্দরবান শহরে এসেছেন প্রতিবাদ জানাতে।

বান্দরবানের রুমা প্যারিসনকে সেনানিবাসে উন্নীত করতে ১৯৭৭ সাল থেকে এই সাড়ে নয় হাজার একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। কিন্তু সে সময় ভূমি মন্ত্রণালয় পরিবেশগত দিকটি বিবেচনা করে এ প্রস্তাবে অনুমোদন দেয়নি। দীর্ঘ বিরতির পর ১৯৯১ সালে এ অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াটি আবারও সক্রিয়

এরপর দুয়ের পাতায়

মুখে মিষ্ট অন্তরে বিষ ভরা। / সেই বন্ধুকে উচিত ত্যাগ করা।।—চাণক্য

পার্বত্য চট্টগ্রাম

(একের পাতার পর)

করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু সেবারও প্রক্রিয়াটি এগোয়নি। বিগত জরুরি অবস্থার সময় সামরিক বাহিনী এ অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া আবারও সামনে তুলে আনে। অধিগ্রহণ-প্রক্রিয়া আবারও সামনে তুলে আনে। অধিগ্রহণ-প্রক্রিয়াটি স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে এক জীবন-মরণ সংগ্রাম। এ অধিগ্রহণ-প্রক্রিয়ার সঙ্গে বর্তমানে আরও যুক্ত হয়েছে রুমা বাজার সংলগ্ন পলি মৌজায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) জন্য আরও অতিরিক্ত তিন হাজার একর জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া, যা সরকার এরই মধ্যে শুরু করে দিয়েছে।

আমরা জানি, উনিশ শতকের শেষভাগে পার্বত্য চট্টগ্রামকে তিনটি সার্কেলে ভাগ করা হয়েছিল। প্রতিটি সার্কেল আবার কয়েকটি মৌজায় বিভক্ত। এসব মৌজার প্রধান হেডম্যানরাই ঐতিহ্যগত ভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি ব্যবস্থাপনার বিষয়গুলো দেখাশোনা করতেন। কিন্তু সেনানিবাস সম্প্রসারনের নামে যে জমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে, সে ক্ষেত্রে হেডম্যানদের মতামত নেওয়া তো হয়নি। হেডম্যানেরাও আজ ভূমি আগ্রাসনের শিকার। অথচ পার্বত্য চুক্তিতে বলা আছে, পার্বত্য চট্টগ্রামে জমি অধিগ্রহণ, ক্রয়-বিক্রয়ে মৌজাপ্রধানের প্রতিবেদন ছাড়া জমি হস্তান্তর করা যাবে না।

পার্বত্য চট্টগ্রামে যেখানে সেনানিবাস রয়েছে, সেখানে সেনানিবাস সম্প্রসারণের জন্য ভূমির অধিগ্রহণ বাড়ছে বৈ কমছে না। অন্যদিকে বন বিভাগও সমানভাবে জনবসতিপূর্ণ এলাকাগুলো সংরক্ষিত বনাঞ্চল ঘোষণা দিয়ে সেখানকার বাসিন্দাদের উচ্ছেদ অভিযান চালাচ্ছে। খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটি জেলার জাওতাধীন দীঘিনালার ছয়টি মৌজায় প্রায় সাড়ে ১২ হাজার একর জমিকে বন বিভাগ সংরক্ষিত বনাঞ্চল ঘোষণা করেছে। এ অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার আগে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো স্থানীয় বাসিন্দাদের মতামতের তোয়াক্কা না করে একের পর এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় ওই এলাকার জনগণ সর্বদা উচ্ছেদ-আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে। অথচ এই অধিগ্রহণের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ উচ্ছেদ-পরবর্তী পরিস্থিতি কীভাবে মোকাবিলা করবে, সে বিষয়ে কোনো উত্তরণের উপায় আজ পর্যন্ত জানানো হয়নি।

পার্বত্য চট্টগ্রামে শুধু সরকারিভাবে জমি অধিগ্রহণ হচ্ছে তা নয়, সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা, অবসরপ্রাপ্ত সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা, শিল্পপতি, ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা পার্বত্য চট্টগ্রামের হাজার হাজার একর জমি ইজারা নিয়ে স্থানীয় অধিবাসীদের উচ্ছেদ করছে।

৫ মে বেশ কয়েকটি জাতীয় সংবাদ মাধ্যমে একটি খবর বেরিয়েছে, খাগড়াছড়ির রামগড়ে দুটি খামারে সন্ত্রাসীরা ১০ হাজার ফলজ গাছ কেটে দিয়েছে। এ ধরনের ঘটনা অবশ্যই নিন্দনীয়। খবরের কাগজের বদৌলতে বাগান দুটির মালিকের পরিচয় পাওয়া গেছে। কিন্তু এ রকম অসংখ্য খামারের মালিক রয়েছেন, যাঁরা হাজার হাজার একর পাহাড়ি ভূমি ইজারা নিয়েছেন। কিন্তু ওই জমিতে যেসব পরিবার বছরের পর বছর বসবাস করে আসছে, তারা জানতেই পারেনি তাদের এ ভিটেমাটি দুর্নীতি রাজ প্রশাসন কোনো কোম্পানি বা শিল্পপতির কাছে ৯৯ বছরের জন্য ইজারা দিয়ে দিয়েছে।

আমরা জানি পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘদিনের সমস্যার মূলে রয়েছে ভূমিবিরোধ। ভূমিবিরোধ যত দিন জিইয়ে থাকবে, তত দিন সাজেক, লংগদু, রামগড়ের মতো ঘটনা সংগঠিত হতে থাকবে। এ রকম সাম্প্রদায়িক সহিংসতার কারণে মৌলবাদী জঙ্গিগোষ্ঠীগুলো যেমন পাহাড়ে নিজেদের আড়াল করার সুযোগ পাচ্ছে, তেমনি পাহাড়ে সামরিক ঘাঁটি বহাল রাখার এটি মোক্ষম অস্ত্রও বটে।

ভূমিবিরোধ নিষ্পত্তি নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ কমিটি গুলোর মধ্যে সমন্বয়হীনতা (সূত্র ঃ প্রথম আলো) এবং সামরিক ও বেসামরিক কর্তৃপক্ষের ভূমি অধিগ্রহণে পত্রিয়ায় জাতাকলে পড়ে পাহাড়ের মানুষ আর কতকাল এর খেসারত দিয়ে যাবে, সে প্রশ্ন এখন সবার।

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন

মোহাম্মদ মোজহারুল ইসলাম

(বাংলাদেশ) ঃ ০৬-০৯-১৯৬৫ তারিখে পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু এবং ০৬-০৯-১৯৬৫ তারিখে তদানীন্তন পাকিস্তানে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়। ওই একই দিনে Defence of Pakistan Ordinance জারি করা হয় এবং Defence of Pakistan Ordinance-এর ১৮২ নং রুলের ১নং উপধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ০৯-১২-১৯৬৫ তারিখে Enemy Property বা শত্রু সম্পত্তি আইন জারি করা হয়। এ আইনবলে যেসব ভূমির মালিক এদেশ ছেড়ে চিরতরে চলে গেছেন এমন কোন দেশে বসবাস করছেন, যা পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধরত অবস্থায় আছে সেসব ভূমি মালিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। সেই ভূমি মালিক চিরতরে এদেশ ছেড়ে চলে গেছেন কিনা তার নিয়ামক হিসেবে নাগরিকত্বকে ধরা হয় এবং সে সময় একমাত্র ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধরত ছিল। সুতরাং শত্রু আইন শুধু তদানীন্তন পাকিস্তান থেকে চলে যাওয়া ভারতীয় নাগরিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল।

এই আইন কার্যকর প্রক্রিয়ায় প্রত্যেক জেলায় (সাবেক জেলায়) শত্রু-সম্পত্তি চিহ্নিত করে একটি করে তালিকা প্রস্তুত করা হয়। তাকে সেনসাস তালিকা বলা হয়। কিন্তু বিভিন্ন কারণে এ তালিকা বিশেষ ত্রুটিপূর্ণ হয়েছিল। ফলে বহু বাংলাদেশি নাগরিকের সম্পত্তি এ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে শত্রু-সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হয়েছিল।

ভুলক্রমে তালিকাভুক্ত করা এসব সম্পত্তি অবমুক্ত না করার কারণে জনদুর্ভোগ চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়। একসময় এ আইন নিবর্তনমূলক আইন হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ভুলক্রমে তালিকাভুক্ত সম্পত্তি অবমুক্ত করার লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে বিভিন্ন সময়ে সার্কুলার জারি করা হয়। সর্বশেষ ১৬-২-৯১ তারিখে ভুলক্রমে গৃহীত অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্ত করার উদ্দেশে ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে একটি সার্কুলার জারি করে সব জেলা প্রশাসককে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল। ওই সার্কুলারের ৮নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছিল ভ্রমাত্মকভাবে অর্পিত সম্পত্তির তালিকাভুক্ত সম্পত্তি অবমুক্তির জন্য জমির মালিকানার দাবিদার সরাসরি জেলা প্রশাসকের কাছে আবেদন করবেন। জেলা প্রশাসক আবেদনকারীর পক্ষ এবং সরকারি পক্ষের বক্তব্য শুনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। সুতরাং নির্দেশনা ছিল সুস্পষ্ট। বস্তুত ১৯৬৬ সাল থেকে ভুলক্রমে গৃহীত সম্পত্তি অবমুক্তির জন্য বহুবার বহু নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। কিন্তু অতি নগণ্য পরিমাণ সম্পত্তি অবমুক্ত করা হয়েছে। এমনকি সম্পূর্ণ এদেশীয় কিংবা মুসলমানের সম্পত্তি সেনসাস তালিকা থেকে অবমুক্তি করা অত্যন্ত দুরূহ (next to impossible) ছিল। স্মরণ করা যেতে পারে যে, ১৯৭৪ সালের পর শত্রু সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি নামে অভিহিত হয়।

সুতরাং ১৯৬৬ সাল থেকে এখন পর্যন্ত যে পরিমাণ অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্ত করা হয়েছে তার পরিমাণ নিতান্তই কম। অথচ এটা সর্বজনস্বীকৃত শত্রু সম্পত্তি/অর্পিত সম্পত্তি আইন একটি নিবর্তন মূলক আইন এবং তার অপপ্রয়োগ থেকে জনগণকে মুক্তি দেয়া প্রয়োজন।

এ উদ্দেশ্যে অর্থাৎ ভুলক্রমে তালিকাভুক্ত অর্পিত সম্পত্তি দ্রুত অবমুক্তির উদ্দেশ্যে ২০০১ সালে অর্থাৎ বিগত আওয়ামী লীগ সরকার আমলের শেষ ভাগে ১৬নং আইন সংসদে গৃহীত হয়। এ আইনের উপক্রমণিকায় বলা হয়েছে, অর্পিত সম্পত্তি বাংলাদেশি মূল মালিক বা উত্তরাধিকারীর বাংলাদেশি স্বার্থাধিকারী (Successor in interest)-এর নিকট প্রত্যর্পণ এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন।

বস্তুত অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তির কার্যক্রমে গতি সঞ্চার করা এ আইনের উদ্দেশ্য ছিল। উদ্দেশ্য অন্তত মহৎ। কিন্তু এ আইন কার্যকর হওয়ার আগেই সরকার পরিবর্তন হয়ে গেলে এ আইনটি কার্যকর করার সব উদ্যোগ বন্ধ হয়ে গেল। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর আইনটি কার্যকর করার জন্য আবার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তার জন্য সরকারকে সাধুবাদ জানানো প্রয়োজন। কিন্তু এ আইন কার্যকর করার প্রক্রিয়া শুরু করতে গিয়ে আইনটি অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয় বলে কর্তৃপক্ষ মনে করে। এ প্রেক্ষিতে আইনটি প্রয়োজনীয় আছে। কিন্তু মূল আইন অর্থাৎ ২০০১ সালের ১৬নং আইন এবং সংশোধনী আইন উভয়ই নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করলে কতকগুলো গুরুতর ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হবে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাবে এ আইনের কিছু বিধান অন্য আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। বিষয়গুলো বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন।

১. ২০০১ সালের ১৬নং আইনের ২ (এ) ধারায় বলা হয়েছে, প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি অর্থ অর্পিত সম্পত্তি আইনের অধীনে তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছে এবং ৯(১)-এ বলা হয়েছে এ আইন বলবৎ হওয়ার ১৮০ দিনের মধ্যে সরকার এ ধারার বিধান অনুযায়ী প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির জেলাওয়ারি তালিকা প্রস্তুত করিয়া সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রকাশ করিবে।

এ আইনের প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকা বিভ্রান্তিকর। সরকার যদি একটি গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঘোষণা দেয় যে, এ তালিকায় যেসব সম্পত্তি অন্তর্ভুক্ত আছে তা প্রত্যর্পণযোগ্য। অর্থাৎ ইতোমধ্যে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত সমুদয় সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করার যোগ্য তাহলে ট্রাইবুনালের প্রয়োজন হতে পারে না কিংবা সরকারি সিদ্ধান্ত অবজ্ঞা করে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কোন সম্পত্তি অবমুক্ত করতে অস্বীকার করতে ট্রাইবুনালের এখতিয়ার থাকবে না। তার চেয়ে সোজা কথা সোজা ভাষায় বলা ভালো। সেক্ষেত্রে প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকা না বলে অর্পিত সম্পত্তির চূড়ান্ত তালিকা বললেই বিতর্কের শেষ হয়ে যেতে পারে।

২। ২০০১ সালের ১৬নং আইনের ২নং ধারায় বলা হয়েছে, কোন অর্পিত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা হইয়া থাকিলে ওই সম্পত্তির বিপরীতে জমা থাকা ক্ষতিপূরণের টাকা উহার মালিককে এই আইনের বিধানবলি অনুসারে প্রদান করা হইবে।

এই আইনের কথাটি যোগ করে আইনের এই বিধানকে The Acquistion and Requistion ordinance ১৯৮২ আইনের সংশ্লিষ্ট ধারার সঙ্গে সাংঘর্ষিক করে ফেলা হয়েছে। বস্তুত সম্পত্তি অধিগ্রহণের যাবতীয় কার্যক্রম ১৯৮২ সালের Acquisition আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই সুনির্দিষ্ট আইনের ভিতর অর্পিত সম্পত্তির আইনের অনুপ্রবেশ করানো সম্ভব নয়। অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের অর্থ পরিশোধের জন্য Acquisition ordinance-এ সুস্পষ্ট বিধান আছে সেই বিধান অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের অর্থ বিতরণ করতে হবে। অর্পিত সম্পত্তির প্রত্যর্পণ আইনের কোন বিধান সেখানে কার্যকর করা সম্ভব নয়। সুতরাং কথাগুলো এরকমভাবে বলা যেতে পারে, কোন অর্পিত সম্পত্তি অধিগ্রহণকরা হইয়া থাকিলে... সংশ্লিষ্ট আইনের বিধানবলি অনুসারে...পরিশোধ করা হইয়া থাকিলে...সংশ্লিষ্ট আইনের বিধানাবলি অনুসারে...পরিশোধ করা হবে। এ আইনের বিধান অনুসারে কথাগুলো ৬(৮) শর্ত অনুচ্ছেদে আবার ব্যবহার করা হয়েছে। সেখানেও অনুরূপ সংশোধন প্রয়োজন হবে।

৩। ২০০১ সালের ১৬নং আইনের ১০(৩) ধারায় বলা হয়েছে, প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকায়...করিতে পারিবেন।

এই ধারাটি সরকারের ইতোমধ্যে বলবৎ নীতিমালার পরিপন্থী এবং হিন্দু ধর্মীয় দেবত্তোর আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। ২৫/৩/১৯৭০ তারিখে মোমো নং-১৮৭২-২১৪/৬৮ ড্র.ত্র স্মারকে ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে একটি সার্কুলার জারি করা হয়। তাতে বলা হয়, Debottar property belong to the Deity. The shebait whether in India or in Pakistan can not claim it to be his

এরপর তিনের পাতায়

সঠিক জিনিস ছেড়ে দিয়ে নকলের দিকে ধায়। / তারা আসল নকল উভয়ই হারায়।। — চাণক্য

own. The property belonging to such deity can not be taken to be enemy property, and enemy property cell may withdraw hands from similar cases of debottar property.

(দেবত্তোর সম্পত্তির মালিক স্বয়ং দেবতা। সেবাইত, তিনি ভারতেই থাকুন কিংবা পাকিস্তানে থাকুন, সম্পত্তি নিজের বলে দাবি করতে পারেন না। দেবতার মালিকানাধীন এরূপ সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি হতে পারে না এবং শত্রু সম্পত্তি সেল এরূপ দেবত্তোর সম্পত্তি থেকে হস্ত প্রত্যাহার করে নিবেন।) সুতরাং কোন সম্পত্তি দেবত্তোর সম্পত্তি হিসেবে রেকর্ড করা হয়ে থাকলে তা শত্রু সম্পত্তি বলে গৃহীত হবে না। যদি হয়ে থাকে তাহলে তা অবৈধভাবে হয়েছে। তার জন্য নতুন আইনের প্রয়োজন নেই।

এ ধারায় আরও বলা হয়েছে, 'সম্পত্তি প্রত্যর্পণের জন্য কোন ব্যক্তি ট্রাইব্যুনালের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন না।' কথাগুলো হিন্দু দেবত্তোর আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। হিন্দু দেবত্তোর আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। হিন্দু দেবত্তোর আইনের বলা আছে, দেবত্তোর সম্পত্তির স্বার্থরক্ষার জন্য যেকোন হিন্দু ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি যে কোন আদালতে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন। সুতরাং ১৬নং আইনের ১৫ ধারা অপ্রয়োজনীয়।

৪। ২০০১ সালের ১৬নং আইনের ১৫/২(ক) ধারায় বলা হয়েছে, দেবত্তর সম্পত্তির ক্ষেত্রে আবেদনকারী সেবায়েত কিনা এবং বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা কিনা তাহা নির্ধারণ করিয়া...?' এই কথাগুলো দেবত্তর আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। বিষয়টি ইতোপূর্বে আলোচিত ২৫-৩-৭০ সালের সার্কুলারে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সেবায়েত দেবত্তর সম্পত্তির মালিক নয়। সুতরাং সেবায়েতের নাগরিকত্ব নির্ধারণের প্রয়োজন নেই, কারণ দেবত্তর সম্পত্তির মালিক স্বয়ং দেবতা। সেবায়েত দেবত্তর সম্পত্তির ব্যবস্থাপক মাত্র।

৫। ২০০১ সালের ১৬ আইনের ১৫/২(খ) ধারায় বলা হয়েছে, 'উক্ত সম্পত্তির কোন সেবায়েত বা মোহন্ত না থাকিলে উহার ব্যবস্থাপনার ও পরিচালনার উদ্দেশে স্থানীয় সংশ্লিষ্ট সম্প্রদাযের অনধিক পাঁচ সদস্য সমন্বয়ে একটি পরিচালনা কমিটি গঠন করিয়া ওই কমিটির নিকট সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিবেন।' সেবায়েত নিয়োগের জন্য সুস্পষ্ট বিধান হিন্দু ধর্মীয় দেবত্তোর আইনের দেয়া আছে। তাছাড়া বিষয়টি ধর্ম মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ারভুক্ত। সুতরাং ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রণীত কোন আইনে দেবত্তোর সম্পত্তির ক্ষেত্রে কার্যকর করা যাবে না।

৬। ২০০১ সালের ১৬নং আইনের ১৫(৩) ধারায় বলা হয়েছে 'দেবত্তোর সম্পত্তি প্রত্যার্পণের ব্যাপারে একাধিক ব্যক্তি আবেদন করিলে জেলা প্রশাসক এইরূপ আবেদন একযোগে নিষ্পত্তি করিবেন। 'কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে বিরোধ মীমাংসার জন্য জেলা প্রশাসকের কোন এক্তিয়ার নাই। দেবত্তোর আইনের বলা হয়েছে, সেবায়েতের পদ নিয়ে কোন বিরোধ দেখা দিলে তা আদালতে নিষ্পত্তি হবে। সুতরাং আইনটি হিন্দু দেবত্তোর আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। তাছাড়া দেবত্তোর সম্পত্তি সম্পর্কিত আইনের যে কোন পরিবর্তন করার এখতিয়ার একমাত্র ধর্ম মন্ত্রণালয়ের, ভূমি মন্ত্রণালয়ের নয়।

৭। ২০০১ সালের ১৬নং আইনের ১৬ ধারায় ট্রাইবুনাল গঠনের কথা উল্লেখ আছে। ১৬(৪) ধারায় বলা হয়েছে জেলা জজ বা অতিরিক্ত জজ পর্যায়ের বিচার বিভাগীয় একজন কর্মকর্তা সমন্বয়ে ট্রাইবুনাল গঠিত হবে। এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে অর্পিত সম্পত্তি দ্রুত অবমুক্ত করে ভূমি ব্যবস্থাপনা স্বচ্ছতা আনার লক্ষ্যে এ আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে। কিন্তু ট্রাইবুনাল গঠনের ব্যাপারে তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে। সেটি হচ্ছে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ট্রাইবুনাল গঠনের জন্য জেলা জজ পর্যায়ের বিচারক পাওয়া যায় না। বিচারকের অভাবে মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি হয় না। অন্যদিকে আইনের সীমাবদ্ধতা আরোপিত হওয়ার কারণে এবং যথেষ্ট সংখ্যক বিচারক না পাওয়ার কারণে প্রয়োজনীয় ট্রাইবুনাল গঠন করা সম্ভব হয় না। ফলে জনগণের দুর্ভোগের অবসান হয় না। সুতরাং ট্রাইবুনাল গঠনের প্রক্রিয়া শর্তহীন থাকা প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে জেলা জজ বা অতিরিক্ত জেলা জজ পর্যায়ের' শর্তটি শিথিল করে সরকারের পছন্দমতো, ভূমি বিষয়ে অভিজ্ঞ যে কোন ব্যক্তির সমন্বয়ে ট্রাইবুনাল গঠিত হবে। সেক্ষেত্রে সরকারের হাত প্রসারিত থাকবে এবং সরকার ইচ্ছা করলে যে কোন সংখ্যক ট্রাইবুনাল গঠন করে জনগণকে ভোগান্তির হাত থেকে মুক্তি দিতে পারে।

৮। ২০০১ সালের ১৬নং আইনে একটি ঐতিহাসিক সংযোজন হচ্ছে ৯ (৬) ধারা। এ ধারায় বলা হয়েছে 'এই ধারার অধীনে প্রকাশিত প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নহে এমন কোন সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে না এবং উহাতে অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে সরকারের কোন স্বত্ব, স্বার্থ, অধিকার বা দায়দায়িত্ব থাকিবে না।'

এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে এই আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় বলা আছে যে, প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত সম্পত্তি অবমুক্তির জন্য ট্রাইবুনালে যেতে হবে এবং প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির অর্থ যেসব সম্পত্তি, যা এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে সরকারের দখলে বা নিয়ন্ত্রণে ছিল। সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে প্রত্যর্পণ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নয় এরূপ সম্পত্তি সরকারের দখলে কিংবা নিয়ন্ত্রণে নেই। সে সম্পত্তির জন্য সরকার কোন খাজনাও পাচ্ছে না—আবার লিজ মানিও পাচ্ছে না। ১৯৬৫ সালের পর থেকে সরকার এসব সম্পত্তির ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। তাহলে তা নিয়ে জটিলতা এবং টালবাহানা করার দরকার কি। সুতরাং তা ছেড়ে দেয়াই ভালো। ওই বিধান কার্যকর করা হলে জনগণের ব্যাপক উপকার হতো। কিন্তু বিধি বাম। নতুন সরকার ক্ষমতায় এসে এই ৯(৬) ধারাটি সংশোধনের প্রস্তাব নিয়ে এলো। কারণ হিসেবে বলা হলো যে, প্রত্যর্পণ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত সম্পত্তি ছাড়াও বহু সম্পত্তি আছে, যা অর্পিত সম্পত্তি হওয়ার যোগ্য সেসব সম্পত্তি ধরার জন্য অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধন) আইন ২০১০ প্রণয়ন করে সংসদে পেশ করার প্রক্রিয়ায় আছে। কিন্তু এই সংশোধনীর মাধ্যমে যে নতুন সংযোজনের প্রস্তাব করা হয়েছে তাতে পুরো ব্যাপারটা আবার ভয়ঙ্করভাবে জটিল হয়ে গেছে। এক্ষেত্রে আমার সবিনয় নিবেদন এই যে যদি কিছু সম্পত্তি প্রত্যর্পণ তালিকার বাইরে থেকে যায় তাহলে তা অন্তর্ভুক্ত করে প্রত্যর্পণ তালিকা সংশোধন করলেই সমস্যা সমাধান হতে পারে। সেক্ষেত্রে গঠিত ট্রাইবুনাল সব অবমুক্তির আবেদন বিবেচনা করতে পারবে। অবশ্য তার জন্য ট্রাইবুনালের সংখ্যাও যথেষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে।

প্রস্তাবিত সংশোধনীতে মোট তিন পর্যায়ের কমিটি যথা উপজেলা কমিটি, জেলা কমিটি এবং কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এ সম্পর্কে যে আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে তা নিচে ব্যাখ্যা করা হলো—

(ক) এটা সত্যি যে মুল আইনে গঠিত প্রত্যেক ট্রাইবুনালের নিয়োগযোগ্য মোট বিচারকের সংখ্যা একজন। এই ট্রাইবুনালের একজন বিচারক প্রত্যর্পণ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত সম্পত্তি অবমুক্তির আবেদন বিবেচনা করবে। স্মরণ রাখা যেতে পারে যে প্রত্যর্পণ তালিকায় ওইসব সম্পত্তি অন্তর্ভুক্ত আছে তা সরকারের নিয়ন্ত্রণে দখলে আছে এবং তা অবমুক্ত করতে মাত্র একজন বিচারকের সিদ্ধান্তই যথেষ্ট। পক্ষান্তরে প্রত্যর্পণ তালিকাবহির্ভুত অথচ অর্পিত সম্পত্তির দ্বিতীয় তালিকায় অন্তর্ভুক্ত তা হচ্ছে সাত মণ তেলও জুটবে না রাধাও নাচবে না।

(খ) অর্পিত সম্পত্তির দ্বিতীয় তালিকা প্রস্তুতের জন্য সুনির্দিষ্ট কোন নীতিমালার প্রস্তাব নেই। ফলে এ তালিকায় যথেচ্ছ অন্তর্ভুক্তি হওয়ার আশঙ্কা থাকবে এবং তালিকা প্রস্তুতের সময় ব্যাপক দুর্নীতির আশঙ্কাও অমূলক নয়।

(গ) ১৯৬৫ সাল থেকে বিভিন্ন সার্কুলারের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে যেসব সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তা অবমুক্ত করার জন্য জেলা প্রশাসককে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। কিন্তু আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়নি। তার অন্যতম কারণ দীর্ঘসূত্রিতা এবং দুর্নীতি। সুতরাং প্রস্তাবিত আইনের স্বচ্ছতা আনয়ন করা না হলে তা জনগণের দুর্ভোগ লাঘবে একেবারেই সহায়ক হবে না।

(ঘ) অর্পিত সম্পত্তির দ্বিতীয় তালিকা প্রস্তুত হবে উপজেলা পর্যায়ে আবার অবমুক্তির বিবেচনার দায়িত্বে তাদের ওপরই ন্যস্ত করা হচ্ছে। এটা Natural Justice -এর বিপক্ষে।

(৯) ২০১০ সালের সংশোধন আইনের ৪ ধারার মাধ্যমে ৯খ অনুচ্ছেদে অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তির সংক্রান্ত বিধানে বলা হয়েছে, 'প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নহে এইরূপ কোন সম্পত্তি সরকারের নামে রেকর্ডভুক্ত হইলে অবমুক্তির জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।'

এই ধারাটি জমিদারি উচ্ছেদ আইনের সঙ্গে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। জমিদারি উচ্ছেদ আইনে বলা আছে কোন সেটেলমেণ্ট রেকর্ড চূড়ান্ত ভাবে প্রকাশন করার পর তা সঠিক বলে গণ্য হবে। (Presumed to be correct) শুধু উপযুক্ত আদালতের আদেশের বলে তা সংশোধন করা সম্ভব হতে পারে। সুতরাং কোন সম্পত্তি উপজেলার কমিটি কিংবা অন্য যে কোন কমিটি অবমুক্ত করে দিলেও রেকর্ড সংশোধনের আদেশ দেয়ার এখতিয়ার থাকবে না। সেক্ষেত্রে সহকারী কমিশনার ভূমি অফিসে নাম জারি প্রস্তাব অনুমোদন করা সম্ভব হবে না। ফলে সংশ্লিষ্ট পার্টিকে আবার আদালতে যেতে হবে। অর্থাৎ তার ভোগান্তিই সার, কাজের কাজ কিছু হবে না।

সব শেষে একটি কথাই বলা যায় যে, ২০০১ সালের ১৬নং আইনের কিছু অত্যাবশ্যকীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করে তা কার্যকর করা হলে জনগণের দীর্ঘদিনের ভোগান্তির অবসান হবে। প্রস্তাবিত অধিকতর সংশোধনী জনগণের ভোগান্তি এবং সংকট বাড়াবে।

বীর যোদ্ধা

শৈলেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

ইতিহাস জাতির জীবনে এক মূল্যবান সম্পদ। প্রকৃত ইতিহাস বিকৃত হলে জাতির মেরুদণ্ড ঘুণে ধরে যায়। জাতি হয়ে পরে নিস্তেজ, হারিয়ে যায় স্বকীয়তা, নিজ দৃষ্টির আড়ালে ধবংস মুখে পতিত হয়। অপরের মুখে বুলি আওড়াতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। আজকাল বিভিন্ন লোকের মুখে শোনা যায় "বাঙালি হিন্দু মার খায়—কাঁদে—পালায়।" ইতিহাস না জানার কারণে এই সব অবান্তর উক্তি আমরা শুনতে পাই। কিন্তু বিপরীত ইতিহাস জানার বা সংগ্রহের প্রচেষ্টা আমাদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না। ব্যতিক্রম ধর্মী শৈলেন্দ্রনাথ বিশ্বাস মহাশয় "বাংলার লাঞ্ছিত মণীষী" নামক ইতিহাস ভিত্তিক পুস্তক রচনা করে আমাদের পিপাসা সামান্য মিটিয়েছেন। উক্ত পুস্তকে "বীর যোদ্ধা" অংশ থেকে এই পত্রিকায় নিয়মিত ধারাবাহিক প্রকাশিত হবে। আশাকরি লেখকের তথ্য সমৃদ্ধ রচনা পাঠ করে মতামত জানাবেন।

যশোর জেলার নব গঙ্গার পূর্ব পাড় ঘিরে ১৮২ খানা নমঃশূদ্র গ্রাম মিলে নলদী পরগনা। অন্য দিকে নবগঙ্গার পশ্চিম পাড়ে ঘিরে ১২৬ খানা নমঃশূদ্র গ্রাম নিয়ে পার নলদী পরগনা গঠিত হয়। দুই পরগনার নমোদের সামাজিক ক্রিয়াকর্ম মূলত একই সঙ্গে হতো। যে হেতু এই দুই পরগনার নলদীর নিকট বড় ইছামতি বিল এবং পার নলদির নিকটে বুরুলিয়া বিল। ফলে উক্ত অঞ্চল দুটিকে সংক্ষেপে ইছামতি বিল এবং বুরুলিয়া বিল অঞ্চল বলা হতো। এই দুই প্রসিদ্ধ বিলের আশেপাশে রাজা সীতারাম সহ অন্যান্য শাসকের অনেক ঐতিহাসিক সামগ্রী সহ ঐতিহাসিক তথ্য সম্মিলিত বহু জিনিষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ঝামার খোপ, কালিনগর, গোপালপুর বৃটিশ রাজত্বের শেষ শতকের মাঝামাঝি

দুর্জনের মিষ্ট বাক্যে কভু না ভুলিও। / তাদের কথায় বিশ্বাস না করিও।
মিষ্ট কথায় তুষ্ট করে তারা কার্য উদ্ধার করে। / বিষের কলসীর মত ত্যাগ করে তারে।।—চাণক্য

থেকে পাকিস্তান জন্মের প্রায় ২০/২৫ বৎসর পর পর্যন্ত লাঠিয়ালী বিদ্যায় কৃতিত্বের জন্য শুধু বাংলা নয় সমগ্র ভারতে বিখ্যাত ছিল।

এদেরই পূর্ব পুরুষ ১২ (বার) ভুঁইয়াদের সময় এবং তারও আগের রাজ বংশের শাসনকালে নমঃশূদ্র লাঠিয়ালেরাই প্রধান সৈনিক ছিলেন। বার ভুঁইয়াদের আমলে বিল ইছামতি এবং বিল বিরুলিয়া সম্পূর্ণভাবে জলকরহীন অবস্থায় নমঃশূদ্রদের দখলে ছিল। বৃটিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে নলদীর জমিদারগণ পুনরায় জলকর চালু করলে রতিকান্ত সর্দারের কাজে এবং ব্যবসায় সন্তুষ্ট হয়ে পুনরায় নামমাত্র জলকরের বিনিময়ে উক্ত দুই বিলে নমঃশূদ্রের আধিপত্য পুনঃস্থাপিত হয় যা কিনা পাকিস্তান হবার পরেও চালু ছিল।

এদের সঙ্গে সমান তালে বা কখনও এদের থেকে অনেক বেশী বিক্রমশালী লাঠিয়াল বাংলার অন্যান্য প্রান্তেও তাদের বীরত্বের নিদর্শন রেখে গিয়েছে। কিন্তু তাদের বংশের লোক বা পাড়া প্রতিবেশী সেই ধারাকে ধরে রাখতে পারে নাই। যেমন বাংলার শ্রেষ্ঠ লাঠিয়াল নিধিরাম সর্দার, অনন্ত সরদার—প্রমুখ। কিন্তু ঐ দুই দিকের অধিবাসীগণ বংশানুক্রমে লাঠিয়ালী তাদের পেশা হিসাবে গ্রহণ করে তাদের পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্যপূর্ণ বীরত্ব এবং কৃতিত্বকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। কথিত আছে এই এলাকায় নমঃশূদ্রদের প্রথম যে দলটি বসবাস শুরু করে তারা এসেছিল নদীয়ার নবদ্বীপ এলাকা থেকে। এরা ছিল এক রোখা, তেজস্বী এবং স্বাধীনচেতা মানুষ। বিল পুরুলিয়া এবং বিল ইছামতির নমঃশূদ্রগণ তাদেরই বংশধর। এরা প্রধানত ৪টি প্রধান বংশে বিভক্ত ছিল ঢালী শিরালী, বালা এবং বিশ্বাস। এছাড়াও বাইন, বৈরাগী, রায়, মুগুর প্রভৃতি ছিল।

লাঠিয়ালী শিখে ছোট খাটো কাজিয়ায় অংশ গ্রহণ করলে তাদের লাঠিয়াল বলে গণ্য করা হোত। কিন্তু সর্দার হোতে গেলে অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে তবেই তাকে নামের আগে বা পরে সর্দার বলে পরিচয় মিলত। যেমন পর পর বেশ কয়েকটি কাজিয়ায় অংশ গ্রহর করা। প্রতিটি লড়াইয়ে জয় পরাজয়ের মাপ কাঠি ছিল—ছিল কে কতটুকু বীরত্ব, কতটুকু রণকৌশল দেখাতে পেরেছে। নিজের দলের উপরে তার ক্ষমতা কতটুকু বিস্তার করতে পেরেছে। যারা কাজিয়া দেখেছে উক্ত লাঠিয়ালের প্রতি তাদের ধারনা কি? তার ব্যক্তিগত সমর নৈপুন্যের সঙ্গে সংগঠনিক ক্ষমতা কিরূপ এসব বিবেচনা করেই এক এক জন বিশিষ্ট ঢালী বা যোদ্ধাকে সর্দার উপাধি প্রদান করা হোত। সাধারণতঃ দলপতিই তার ঘোষণার মাধ্যমে জানিয়ে দিতেন আজ থেকে অমুককে তার বীরত্বের জন্য সর্দার উপাধি দেওয়া হল। রাজেন্দ্রনামে এক লাঠিয়াল বিনা ঢালে লড়াই করতেন। একবার শত্রু পক্ষ তার মাথায় বল্লম বসিয়ে দিলে তিনি নিজ হাতে ঐ বল্লম টেনে বের করেন এবং কোমরের গামছা দিয়ে মাথায় ফেট্টি বেঁধে কয়েক মিনিট পিছনে দাঁড়িয়ে থেকে লক্ষ করেন শত্রু পক্ষের কার বল্লম তার কপালে লেগে ছিল। লক্ষ স্থির করে তিনি প্রায় ৫০ হাত পিছনের থেকে সড়কী হাতে দৌড়ে এসে সেই শত্রুকে বল্লম মেরেছিলেন। শত্রুর ঢাল ভেদ করে, তার ভুড়ি ভেদ করে সড়কী মাটিতে ঢুকে গেয়েছিল। শত্রু পক্ষ এই দেখে আহতকে ওখানে ফেলে পিছতে পিছতে পালিয়েছিল। এবং রতিকান্ত সর্দার নাকি ঐ একবারের কাজিয়া দেখেই রাজেন লাঠিয়ালকে সর্দার উপাধি দিয়েছিলেন।

ইছামতির ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে দেখা যায় ঐ নদীর তীরে পাচপোতা, আংরাইল, নজরপুর ইত্যাদি নামে বহু স্থানে ইংরেজ সাহেবদের নীলকুঠি ছিল এবং প্রত্যেকটি কুঠিতে সাহেবদের কিছু কিছু বাছাই করা লাঠিয়াল ছিল তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের এবং নগন্য সংখ্যায় হলেও ২/৫ জন মুসলমান মাঝে মধ্যে পাওয়া যেত। এদের মধ্যে মোমাহাটি নীলকুঠির লাঠিয়াল রসিক দল (মল্লিক) খুবই নামকরা লাঠিয়াল ছিলেন।

মুর্শিদাবাদ ইতিহাসে পাওয়া যায় (৫৬৬ পৃঃ) জমিদার রাজ সিংহের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ১৭৭৩ সালে মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, রংপুর, দিনাজপুর এবং উক্ত সময়ে একমাত্র নমঃশূন্য এবং মুসলমান ভিন্ন অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা কৃষি কাজ করতেন না।

বাংলার অত্যাচারী নীল কুঠিয়ালদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম যিনি করে ছিলেন, যার পরাক্রমে অসংখ্য ইংরেজ যশোহর, ২৪ পরগণা এলাকায় চির নিদ্রায় নিদ্রিত হয়েছিল সেই বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন নমঃশূদ্র সন্তান রামতনু বিশ্বাস। দেশভক্ত সমাজভক্ত হিন্দু জাতির রক্ষক ছিলেন এই নমঃশূদ্র মানুষেরা। ইতিহাস গড়েছেন, অথচ যারা ইতিহাসের কোথাও স্থান পাননি সেই অবহেলিত মানুষের সত্যিকারের অবদানের কথা অতি সংক্ষেপে তুলে ধরা হল যাতে অন্ততঃ নমঃশূদ্র সমাজের মানুষ জানতে পারে তাদের পূর্বপুরুষগণ দেশের জন্য, হিন্দু জাতির জন্য, নমঃশূদ্র সমাজের জন্য কি অবদান রেখেছিলেন। তাদের অবদানের কথা, তাদের বীরত্বের কথা স্মরণ করে প্রতিটি নমঃশূদ্রের বুক গর্বে ভরে উঠবে এই আশায় আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

নমঃশূদ্রদের সামরিক প্রতিভার পরিচয় দিতে গেলে যাদের নাম প্রথমে স্মরণে আসে তাদের মধ্যে রামতনু বিশ্বাস, রতিকান্ত সিরালী—নিধিরাম বিশ্বাস, গদাই মল, মোহন রায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পল্লীকবি জসিমুদ্দিন তার কাব্য গ্রন্থ ‘‘সোজন বাদিয়ার ঘাটে’’ হিন্দু মুসলমানের কাজিয়ায় কয়েক জন হিন্দু বীরের যে চিত্র তুলে ধরেছেন তার কিছুটা নিম্নরূপ ঃ—

নমর মাঝে সকল কাজে আগে
যাহার ঠাঁই,
তেলিহাটির গদাই মল তুলনা
যার নাই।
গদাই মল, দেয় ফাল আট কাঠা
ভুঁই জুড়ে,
আকাশ চিরে বিজলী ছুটে বর্ষা
যখন ছোড়ে।
এল-রাম হাতি, যুদ্ধে মাতি, আছাড়
(বাপুড়) মায়ের বুকে
বৈশেখ মাসে যাট (বিদ্যুৎ) যেমন
গিন্নীর বুকে ঠুকে।
এল-নিধিরাম যেমন নাম, তেমন
তাহার কাম
বন সজারুর মতন তাহার সকল
গায়ে চাম।
বারুদ গুলি, মুখে তুলি চিবোয়
যেমন মুড়ি,
দশটা কাইজা শেষ করে সে
হাতে দিয়ে তুড়ি।
এল-মোহনরায়, পুবেরবায় মন্ত্র
ছুড়ি ছুড়ি,
যোলশো ডাক-ডাকিনী তার
সঙ্গে নাচে ঘুরি
এমনি করে দিনের পর যতই
দিবস চলে,
নম মুসলমান মাতিল রণের
কোলাহলে।”

ঐ দেশবরেণ্য প্রতাপশালী কয়েকজন তপসিলী বীরেদের জীবনী সংক্ষেপে তুলে ধরছি—

গৌর হরি বিশ্বাস

ভারত ভারতীয়দের জন্য, ইংরেজ তোমরা বিদেশী অতএব ইংরেজ ভারত ছাড়ো। ইংরেজ যে আবেদন নিবেদন শুনে ভারত ছাড়বে না বাংলার দামাল ছেলেরা তা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই ছোট ছোট দল বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন ইংরেজ তথা ইংরেজের পা চাটা ভারতীয় পুলিশ কর্মীদের উপর। এই আন্দোলন ছিল জাতি-বর্ণের বাইরে, সেখানে দীর্ঘ কারাবরণ থেকে জেল ফাঁসি পর্য্যন্ত সব জাতির সব সম্প্রদায়ের মানুষ সমানভাবে এগিয়ে এসেছিল কিন্তু প্রচারে বা ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই পেয়েছে কেবল বিনয়-বাদল-দীনেশের মত উচ্চবর্ণের যুবকেরা। যে যুবকের ট্যবুরিয়ায় করে ছদ্মবেশে খুলনা থেকে চট্টগ্রাম গিয়েছিলেন বিপ্লবীরা সেই তরুণী মাঝির নাম কিন্তু ইতিহাসে নেই। সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত, মাষ্টারদা সহ বিশেষ বিশেষ বিপ্লবী মাঝে মধ্যে যার বাড়ীতে আশ্রয় নিতেন, গ্রহণ করতেন আর্থিক সাহায্য সেই রাজ কুমার মণ্ডলের নাম কিন্তু লোক চক্ষুর আড়ালেই রয়ে গেল। এই রাজকুমার মণ্ডলের বড় ছেলে যখন ইঞ্জিনিয়ার হলেন, ইংল্যাণ্ড থেকে মোটা মাইনের ভাল চাকরীর ডাক পেলেন তখন রাজকুমার মণ্ডল দ্বিধাহীন কণ্ঠে বসলেন, যে ইংরেজ ভারত মাতাকে জোর করে শোষণ করছে সেই দেশে আমার ছেলে গোলামী করতে যাবে না। তিনিই রাজকুমার মণ্ডল। তারপর আছে কি নগেন ঠাকুরের নাম? আছে কি গৌরহরি দাসের নাম? আছে কি কংসারি হালদারের নাম? ইতিহাসে কি তাদের কোন নামগন্ধ আছে? ঠিক তেমনি অগ্নিযুগের অন্যতম বিপ্লবী গৌরহরি বিশ্বাসের বিষয়ে কিছু না জানালে বিপ্লবী ইতিহাসকে সঠিকভাবে জানা যাবে না।

১৮৯৪ সালে উঃ ২৪ পরগনায় পাথরঘাটা জমিদারের ঘরে গৌরহরি বিশ্বাসের জন্ম হয়। তার পিতা কৃষ্ণকান্ত বিশ্বাস একজন দয়ালু ধর্ম্মনিষ্ঠ জমিদার ছিলেন। পাথরঘাটা হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন এবং ১৯২২-২৩ সালে পূর্ণ যুবক গৌরহরি, স্বাধীন ভারত গড়ে তুলবার আন্দোলনকারীদের দলে ভিড়ে যান। কিছুটা বর্ত্তমানের নকশালদের মত ঘর ছেড়ে বাইরে থাকতে ভালবাসতেন। তিনি একজন স্মরণীয় নেতা যিনি মহিষবাথান “লবন” আন্দোলনের নেতৃত্বে দেন। এর পরে বিদেশী দ্রব্য বর্জন, আইন অমান্য, চৌকিদারী কর বন্ধ, মাদক দ্রব্য বর্জন হয়েও তিনি সারা জীবন ছিলেন খেটে খাওয়া মানুষের দরদী বন্ধু, তাদের কাছের মানুষ। তার নেতৃত্বে খেটে খাওয়া মানুষের দরদী বন্ধু, তাদের কাছের মানুষ। তার নেতৃত্বে রাজার হাট এলাকার জনসাধারণ এক কথায় আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। তার দেশাত্মমূলক চিন্তাভাবনা ও কাজকর্মের জন্য জনসাধারণ তাকে ‘‘স্বদেশী বাবু’’ নামে ডাকতেন। আজও লোকে বলে ঐ তো স্বদেশী বিশ্বাসের বাড়ী। ইতিহাসে নাম না থাক অঞ্চলের মানুষের মনে স্বদেশীবাবু অক্ষয়—অমর হয়ে আছেন।

অগ্নি যুগের বিপ্লবী আন্দোলনের অন্যতম নায়ক বিপিন বিহারী গাঙ্গুলীর দক্ষিণ হস্ত ছিলেন গৌরহরি বিশ্বাস। স্বদেশীবাবু, লক্ষ্মী প্রামানিক, সতীশ দাসগুপ্ত, প্রফুল্ল সেন, প্রভাত বাবুর মত দেশপ্রেমিক দের সাথে বহুবার জেল খেটেছেন। গৌরহরি বাবু আঞ্চলিক বিপ্লবী নারীবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন যার নেতৃত্বে ছিলেন অষ্টমী ঢালী এবং মোক্ষদা লস্কর। এরপর তিনি সারা বাংলার রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেন।

রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সমাজ সংস্কার মূলক কাজও চালিয়ে যান। তিনি বিধবা বিবাহের পক্ষে ছিলেন এবং তার নিজের প্রচেষ্টায় কম করে ৮/১০ টি বিধবাকে পূণর্বিবাহ দেন। এভিন্ন নিরক্ষরতা দূরীকরণ, জাত-পাতহীন সমাজ গড়ার কাজ করে যান। তিনি একমাত্র ব্যক্তি যার প্রচেষ্টায় উক্ত এলাকার কওরা-বুনো-বাগদি সহ নিম্নবর্গের লোকেরা পাথুরিয়া কালি মন্দিরে প্রবেশ করে পূজা দেবার অধিকার পান। দেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৫১ সালে এই মহান স্বদেশী বাবুর জীবনাবসান ঘটে। ইতিহাসে কিন্তু এই বিপ্লবীর নাম নেই।

লগ অন ক(নে ঃ
nbns.yolasite.com
amardesh.tv
mayerdak.com

কবির কল্পনায় সবই সম্ভব হয়। / মদ্যপের কোন কথাই অসম্ভব নয়।।
মাংসভক্ষণ, সুরাপান, আর মূর্খজন। এই তিন শ্রেণী পশুতুল্য রূপে গণ্য হন।
মানুষের আকৃতি হলেও এরা পশুতুল্য। পৃথিবীর বোঝা এরা নেই কোন মূল্য।। —চাণক্য

প্রকাশক, মুদ্রক —সুভাষ চক্রবর্ত্তী, ৮৫ এ পি সি রোড, কোলকাতা-৯, প্রধান কার্যালয় ঃ স্কুলপাড়া, শ্রীখণ্ডা, কোলকাতা - ১৫২ কর্তৃক প্রকাশিত
আনন্দ প্রিন্টার্স, ৩/১সি মোহনবাগান লেন কোলকাতা - ৪ হইতে মুদ্রিত
সত্ত্বাধিকারী ও সম্পাদক ঃ সুভাষ চক্রবর্ত্তী, ফোন ঃ ৮৯৮১২৮৫৬০৭